# নিউল নগরী

এইচ জি ওয়েলস

# নিতিল নগরী

( In the Abyss )

['In the Abyss' প্রথম প্রকাশিত হয় 'Pearsons Magazine' পত্রিকায় আগস্ট ১৮৯৬ সালে। ১৮৯৭ সালে লন্ডনের 'Methuen & Co.' থেকে প্রকাশিত ওয়েলসের ছোটগল্পের সংকলন 'The Plattner Story and Others' বইটিতে গল্পটি স্থান পায়। সেপ্টেম্বর ১৯২৬ সালে গল্পটি পুনঃপ্রকাশিত হয় 'Amazing Stories' পত্রিকায়।]

ইস্পাত গোলকটার সামনে দাঁড়িয়ে পাইন কুচি চেবাতে চেবাতে লেফটেন্যান্ট বললে, দেখে কি মনে হয়, স্টিভেন্স?।

আইডিয়াটা ভালোই, ভোলা মনেই জবাব দিয়েছিল স্টিভেন্স।

চিঁড়েচ্যাপটা হয়ে যাবে কিন্তু।

জলের চাপ তো সাংঘাতিক। জলের উপরিভাগে এই চাপ প্রতি বর্গইঞ্চিতে চোদ্দো পাউন্ড, ত্রিশ ফুট নিচে তার দ্বিগুণ, ষাট ফুট নিচে তিনগুণ, নলুই ফুট নিচে চারগুণ, নশো ফুট নিচে চল্লিশগুণ, পাঁচ হাজার ফুট নিচে তিনশোগুণ–প্রায় মাইলখানেক–চোদ্দো পাউন্ডের দুশো চল্লিশগুণ–প্রায় দেড় টন। প্রতি বর্গইঞ্চিতে দেড় টন। সমুদ্র যেখানে পাঁচ মাইল গভীর, সেখানে সাড়ে সাত টন–

ইস্পাতের চাদরও তো দারুণ মোটা।

নিরুত্তর রইল লেফটেন্যান্ট।

আলোচনা হচ্ছে স্টিলের একটা অতিকায় বল নিয়ে। ব্যাস প্রায় নফুট। দেখতে অনেকটা দানবিক কামানের গোলার মতো। জাহাজের ওপর বিরাট ভার আর মঞ্চ তৈরি করে বলটা রাখা হয়েছে তার ওপর। এইখান থেকেই নামিয়ে দেওয়া হবে সমুদ্রের জলে। বলের গায়ে দুটো গোলাকার জানলা। একটার ওপর আর-একটা। দারুণ পুরু কাচ দিয়ে ঢাকা। স্টিলের ফ্রেম। একটা জানলা খোলা রয়েছে। লেফটেন্যান্ট এবং স্টিভেন্স সাত সকালেই গোলকের ভেতর দেখে এসেছে। পুরু কুশন দিয়ে মোড়া। কুশনের ফাঁকে ফাঁকে হাতল–সাদাসিধে যন্ত্রপাতি চালু রাখার ব্যবস্থা। ভেতরে ঢুকে জানলা বন্ধ করে দেওয়ার পর শ্বাস-প্রশ্বাসের কার্বনিক অ্যাসিড শুষে নিয়ে তার বদলে অক্সিজেন ছেড়ে দেওয়ার মায়ার্স যন্ত্রটাও গদি দিয়ে সুরক্ষিত। পুরো ভেতরটা এমনভাবে গদি দিয়ে মোড়া যে কামান থেকে গোলার মতো ছুঁড়ে দিলেও ভেতরে যে বসবে, তার গায়ে আঁচড়টি লাগবে না। একটু পরেই কাচের ম্যানহোল দিয়ে সত্যিই এক ব্যক্তির প্রবেশ ঘটবে ভেতরে, গোলক। নিক্ষিপ্ত হবে জলে তলিয়ে যাবে অনেক নিচে–মাইল পাঁচেক তো বটেই।

তারপর? কাচ বেঁকে ভেতরে ঢুকে যাবে–জানলার দফারফা হয়ে যাবে। সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করলে লেফটেন্যান্ট। তখন হুড়হুড় করে জল ঢুকবে ভেতরে। লোহার ফলা ঢুকিয়ে দেওয়ার মতোই জলের খোঁচায় প্রাণটা উধাও হবে চক্ষের নিমেষে। বুলেট বলাও যায়। জলের বুলেট। চিঁড়েচ্যাপটা তো হবেই ভেতরের মানুষ, সেই সঙ্গে পুঁটি দুটুকরো হবে, ফুসফুস ফাটিয়ে দেবে, কানের পরদা—

গোলকের অবস্থাটা? জানতে চেয়েছিল স্টিভেন্স।

বেশ কিছু বুদবুদ ছেড়ে চিরকালের মতো তলিয়ে যাবে কাদার ওপর। রুটিতে মাখন মাখানোর মতো ব্যাপার আর কী।

উপমাটা মনে ধরল লেফটেন্যান্টের নিজেরই। নিজের মনেই বারকয়েক আওড়ে গেল একই কথা।

এলসটিড কথাটা শুনল পেছনে দাঁড়িয়ে। সমুদ্রতলের ভাবী অ্যাডভেঞ্চারার এলসটিড। পরনে ধবধবে সাদা পোশাক। দাঁতের ফাঁকে সিগারেট। টুপির কিনারার নিচে কৌতুক তরলিত দুই চক্ষু।

কী হে ওয়েব্রিজ? লোকজন বেশি মাইনে চাইছে নাকি? রুটিতে মাখন মাখানো নিয়ে। খুব ফাঁপরে পড়েছ দেখছি। আরে বাবা, আজ বাদে কালই তো ডুব মারল জলে। চমৎকার আবহাওয়া। সিসে আর লোহা নিয়ে বারো টন তলিয়ে যাবে টুপ করে। এত ঝামেলা কীসের?

ভাবছি, তোমার অবস্থাটা তখন কী হবে, বললে ওয়েব্রিজ।

দূর! জলের ওপর ঢেউ যতই উঁচুতে উঠুক-না কেন, বারো সেকেন্ডের মধ্যে তলিয়ে যাব সত্তর-আশি ফুট নিচে। সেখানে শান্তি... শুধুই শান্তি!

ঘড়ি-যন্ত্র ঠিকমতো চলবে তো?

পঁয়ত্রিশবার চালিয়ে পরখ করে নিয়েছি।

যদি না চলে?

কেন চলবে না?

বিশ হাজার পাউন্ড দিলেও ওই নচ্ছার গোলার মধ্যে ঢুকব না আমি।

কিন্তু আমি ঢুকব। ভেতরে ঢুকে ক্রু টাইট দিয়ে জানলাটা আগে বন্ধ করব। তারপর ইলেকট্রিক লাইটটা তিনবার জ্বালব, তিনবার নেবাব। বুঝিয়ে দেব, বহাল তবিয়তে আছি। তখন কপিকলে টুপ করে নামিয়ে দেবে গোলা। বলের তলায় সিসের ওজনগুলো যেভাবে ঝুলছে, ঝুলবে ঠিক ওইভাবেই। গোলার ওপরে ওই যে সিসের কাটিমটা রয়েছে, ওতে জড়ানো আছে একশো ফ্যাদম লম্বা দড়ি। তারের দড়ি লাগাইনি ইচ্ছে করেই-কাটতে সুবিধে, ভাসেও ভালো। তারের দড়ি হলে তো ডুবে যাবে। বিষয়টা গুরত্বপূর্ণ। যথাসময়ে বুঝবে।

কিন্তু

প্রত্যেকটা সিসের ওজনের মধ্যে একটা ফুটো রয়েছে দেখছ? একটা করে লোহার রড ঢুকিয়ে দেওয়া হবে ফুটোগুলের মধ্যে দিয়ে। ছফুট নিচে নেমে থাকবে প্রত্যেকটা রড। নিচ থেকে রডে ধাক্কা লাগালেই ধাক্কা লাগবে একটা হাতলে–চালু হয়ে যাবে ঘড়ি-যন্ত্র।

কপিকলে ঝুলিয়ে সবসুদ্ধ জলে নামিয়ে ঝোলানোর দড়ি কেটে দিলেই গোলা ভাসবে জলে। বাতাস ভরতি গোলা। হালকা। সিসের ওজনগুলো তলিয়ে যাবে নিজেদের ওজনেই –কাটিম থেকে দড়িও খুলে যাবে। বেশ খানিক দড়ি খুলে যাওয়ার পর গোলাও তলিয়ে যাবে–দড়ির টানে।

দড়ির টানে কেন? সিসের ওজনগুলো সরাসরি গোলার গায়ে লাগাওনি কেন? স্টিভেন্সের প্রশ্ন।

নিচের ধাক্কা এড়ানোর জন্যে। কিছুক্ষণ পরেই হু হু করে মাইলের পর মাইল নেমে যাবে গোলা। দড়ি না থাকলে আছড়ে পড়ে থেঁতলে যাবে। দড়ির তলায় ঝোলানো সিসের ওজনগুলো আগে ঠেকবে তলায়, কমে আসবে গোলার তলিয়ে যাওয়ার গতিবেগ, আস্তে আস্তে গিয়ে ঠেকবে তলায়, তারপর ভেসে উঠতে থাকবে আস্তে আস্তে।

ঘড়ি-যন্ত্র চালু হবে ঠিক তখন। লোহার ডান্ডাগুলো সমুদ্রের তলায় ধাক্কা দিয়ে ঘড়ি-যন্ত্র চালু করে দিলেই কাটিমে গুটিয়ে যাবে দড়ি। আধ ঘণ্টা থাকব সাগরতলে। ইলেকট্রিক লাইট জ্বেলে দেখব চারপাশ। তারপরেই ঘড়ি-যন্ত্র খুলে দেবে একটা স্প্রিং-এর ছুরি। কেটে দেবে দড়ি। সোডা ওয়াটার বুদবুদের মতো হু হু করে গোলা ভেসে উঠবে ওপরে, দড়িটাই সাহায্য করবে ভেসে উঠতে।

নিচ থেকে অত জোরে উঠে এসে গোলা যদি ঢু মারে কোনও জাহাজের তলায়?

বেশ ফাঁকা জায়গায় কামানের গোলার মতো নামব, উঠব আধ ঘণ্টা পরে। কাজেই দুশ্চিন্তা কীসের?

যদি কোনও সামুদ্রিক জীব ঘড়ি-যন্ত্রে শুড় জড়িয়ে ধরে?

সানন্দে দাঁড়িয়ে যাব।

বলে, মুগ্ধ চোখে ইস্পাতের গোলকের দিকে চেয়ে রইল এসটিড।

.

এগারোটা নাগাদ এসটিডকে নামিয়ে দেওয়া হল কপিকলে করে। আকাশ ঝকঝকে পরিষ্কার। বাতাস মৃদুমন্দ। দিগন্তে কুয়াশা। ওপরের কামরার ইলেকট্রিক আলো জ্বলল তিনবার, নিবল তিনবার। সামান্য দুলছে গোলা। কাচের জানলা দুটো একজোড়া গোল গোল চোখ মেলে যেন অবাক হয়ে দেখছে ডেকের লোকজনদের। ডেকের ওপর গোলাটাকে মনে হয়েছিল না জানি কী বিরাট, জলে নামিয়ে দেওয়ার পর ধু ধু সমুদ্রের মধ্যে মনে হল নিতান্তই পুঁচকে।

দড়ি কেটে দিতেই একটা ঢেউ চলে গেল গোলার ওপর দিয়ে, দুলছে গোলা, ভীষণভাবে ওলট-পালট খাচ্ছে। দশ পর্যন্ত গুনতেই হঠাৎ ঝাঁকুনি দিয়ে সিধে হয়ে গেল কিম্ভুত গোলক।

ক্ষণেকের জন্যে ভেসে থেকেই আস্তে আস্তে গেল তলিয়ে। তিন পর্যন্ত গোনবার আগেই অদৃশ্য হল দৃষ্টিপথ থেকে। অনেক নিচে দেখা গেল আলোর দ্যুতি–আস্তে আস্তে

আলোককণিকায় পর্যবসিত হয়ে মিলিয়ে গেল একেবারেই। অন্ধকার জলে ঘুরপাক খেয়ে গেল কেবল একটা হাঙর।

মাইলখানেক তফাতে সরে এল জাহাজ। ভেসে ওঠার সময়ে ইস্পাতের গোলা তলায় যাতে টু না মারে।

নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে নিঃশব্দে কাটল আধ ঘণ্টা। মাথার ওপর ডিসেম্বরের সূর্য বেশ গরম।

ওয়েব্রিজ কিন্তু বলেছিল, জলের তলায় নাকি এত ঠান্ডা যে, এসটিড নিশ্চয় এতক্ষণে হি হি করে কাঁপতে শুরু করে দিয়েছে।

পঁয়ত্রিশ মিনিট পরেও গোলা ভেসে উঠল না। শুরু হল উৎকণ্ঠা। সূর্য ডুবে যাওয়ার একুশ মিনিট পরেও গোলার পুনরাবির্ভাব না দেখে শুরু হল জল্পনা-কল্পনা। মাঝরাতে আরম্ভ হল দুর্ভাবনা। পাঁচ মাইল নিচে কাদার মধ্যে দড়িদড়া সমেত গোলা আটকে গিয়েছে নিশ্চয়। মায়ার্স যন্ত্র আর কাজ করছে না। অক্সিজেন নেই, খাবার নেই, জল নেই। এসটিড কি আর বেঁচে আছে?

গোলক যেখানে ডুব দিয়েছে, সেই জায়গা ঘিরে গোল হয়ে ঘুরতে লাগল গানবোট। আচমকা বহু দূরে একটা আলোর রেখা জল থেকে ঠিকরে উঠে গেল আকাশ অভিমুখে– শূন্যে আলোকবৃত্ত রচনা করে গিয়ে পড়ল জলে।

এলসটিড!

ভোর হয়ে গেল–তবে নাগাল ধরা গেল গোলকের। কপিকল থেকে আংটা ঝুলিয়ে গোলকের মাথায় লাগিয়ে টেনে তুলে আনা হল ডেকে। ম্যানহোল খুলে উঁকি দিল লেফটেন্যান্ট। কালির মতো অন্ধকার। ইলেকট্রিক লাইট লাগানো হয়েছিল শুধু গোলকের চারপাশ আলোকিত করার জন্যে–ভেতরটা নয়।

ভীষণ উত্তাপ ভেতরে। ম্যানহোলের কিনারা বরাবর রবারের পটি নরম হয়ে গেছে উত্তাপে। নড়াচড়া নেই, উৎকণ্ঠিত প্রশ্নের জবাবও নেই। জাহাজের আলো ফেলে দেখা গেল, মড়ার মতো পড়ে এসটিড। মুখ হলুদবর্ণ, ঘামে চকচকে। ডাক্তার এল। তুলে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দেওয়া হল কেবিনে।

না, মরেনি, কিন্তু স্নায়ুর অবস্থা কাহিল। সারা গা থেঁতলে কালশিটে পড়ে গেছে। দিনকয়েক পড়ে রইল নিস্পন্দ দেহে। মুখে কথা ফুটল সাত দিন পরে। শোনা গেল অত্যাশ্চর্য অভিজ্ঞতার অবিশ্বাস্য কাহিনি।

প্রথম কথাটাতেই প্রকাশ পেল অদ্ভুত জেদ। আবার যাবে ও সমুদ্রের তলায়। গোলকটাকে একটু পালটে নিতে হবে। দড়ি নিয়ে নতুন করে ভাবতে হবে। অসংলগ্নভাবে বলেছিল, সমুদ্রের তলায় কাদা ছাড়া আর কিছু দেখা যাবে না যারা বলেছিল–চোখ তাদের ঠিকরে যাবে সেখানকার দৃশ্য দেখলে। চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা লাভ করেছে এলসটিড–দেখে এসেছে আশ্চর্য এক জগৎ!

খাপছাড়া কথাগুলো গুছিয়ে লেখা হল নিচে।

প্রথমে গোলকটা ভীষণভাবে ওলট-পালট খেয়েছিল ঠিকই। পা ওপরে চলে গিয়েছিল। মাথা নিচের দিকে করে কুশনে আছড়ে পড়েছিল। জানলার মধ্যে দিয়ে মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছিল আকাশ আর জাহাজের ডেকে দাঁড়ানো লোকজনকে।

আচমকা সিধে হয়ে গিয়েছিল গোলক। শুরু হয়েছিল তলিয়ে যাওয়া। সবুজ-নীলাভ মনে হয়েছিল চারপাশের জল। একটু একটু আলো আসছিল ওপর থেকে। ছোট ছোট ভাসমান বস্তু ঝাঁকে ঝাঁকে ধেয়ে যাচ্ছিল ওপরের আলোর দিকে। অন্ধকার আরও গাঢ় হয়েছিল। মাথার ওপর যেন মধ্যরাতের কালো আকাশ–সামান্য সবুজাভ। নিচের জল কালির মতো কালো। খুদে খুদে আলোকময় স্বচ্ছ বস্তু আবছা সবজে রেখা রচনা করে ধেয়ে যাচ্ছিল ওপরদিকে।

পতনের বেগ নাকি মনে রাখবার মতো। ঠিক যেন লিফট নামছে হু হু করে। এবার একটু ভয় হয়েছিল এলসটিডের। অক্টোপাস, তিমি বা ওই জাতীয় কিছুর খপ্পরে পড়লেই তো দফারফা। ঘড়ি-যন্ত্র যদি আর চালু না থাকে?

পঞ্চাশ সেকেন্ড পর মিশমিশে অন্ধকারে প্রখর ইলেকট্রিক আলোয় কেবল দেখা গেল, মাছ বা ভাসমান বস্তু ধেয়ে যাচ্ছে আশপাশ দিয়ে ওপরদিকে–এত জোরে যাচ্ছে যে ভালো করে দেখাও যাচ্ছে না। একবার মনে হল, একটা হাঙর ধড়ফড় করতে করতে ছিটকে গেল পাশ দিয়ে। জলের ঘর্ষণে গোলক তখন গরম উঠছে। অতএব সমুদ্রের গভীরে নাকি কনকনে ঠান্ডা–এ ধারণাটা একেবারেই ভুল।

ঘামে সারা গা সপসপে হয়ে গেছে লক্ষ করে খটকা লেগেছিল এসটিডের। পরক্ষণেই কানে ভেসে এসেছিল সোঁ সোঁ শব্দ। শব্দটা আসছে পায়ের তলা থেকে। বেড়েই চলেছে।

চোখে পড়েছিল বিস্তর বুদবুদ। সাঁ সাঁ করে ধেয়ে যাচ্ছে ওপরদিকে। যেন পাখা ঘুরছে। বাইরে জলের মধ্যে। বাষ্প নাকি? নিশ্চয় তা-ই! হাত দিয়েছিল জানলায়। কাচ গরম। জ্বালিয়ে নিয়েছিল ছোট্ট লণ্ঠনটা। হাতলের ডগায় গদি দিয়ে মোড়া ঘড়িতে দেখেছিল, মোটে দুমিনিট হয়েছে। এরই মধ্যে জলের ঘর্ষণে এত উত্তাপ? কাচ তো ফেটে যাবে এবার। নিচে ঠান্ডা, গোলকের গা গরম–তাপের তারতম্য কাচ তো সইতে পারবে না।

আচমকা কমে এসেছিল তলিয়ে যাওয়ার গতিবেগ। সেই সঙ্গে কমে এসেছিল ওপরদিকে ধাবমান বুদবুদের সংখ্যা। পায়ের তলায় মেঝে অনুভব করেছিল শক্তভাবে। কমে এসেছিল সোঁ সোঁ শব্দ। সামান্য দুলে উঠেই স্থির হয়ে গিয়েছিল গোলক। না, কাচ ভাঙেনি। অঘটন কিছুই ঘটেনি। নির্বিঘ্নে তলদেশ স্পর্শ করতে চলেছে গোলক। খুব জোর আর মিনিটখানেক।

মনে পড়েছিল স্টিভেন্স আর ওয়েব্রিজের কথা। রয়েছে পাঁচ মাইল ওপরে। অত উঁচুতে মেঘও থাকে না।

উঁকি মেরেছিল জানলা দিয়ে। বুদবুদ আর দেখা যাচ্ছে না। সোঁ সোঁ শব্দও একেবারে থেমে গেছে। বাইরে মসিকৃষ্ণ অন্ধকার। নরম ভেলভেটের মতো। ইলেকট্রিক আলো যেখানে যেখানে পড়ছে, শুধু সেই জায়গাগুলোতেই দেখা যাচ্ছে জলের রং হলদেটে-সবুজ। তারপরেই আলোক বলয়ের মধ্যে ভেসে উঠল তিনটে বস্তু। অগ্নিময় আকৃতির মতো। ওর বেশি আর কিছু দেখা যায়নি। বস্তু তিনটে ছোট না বড়, কাছে না দূরে–বোঝা যায়নি।

মাছ ধরার জাহাজে যেমন জোরালো আলো থাকে, প্রায় সেইরকম নীলাভ আলোর রেখা দিয়ে ঘেরা তিনটে আকৃতিই। প্রচুর ধোঁয়া বেরচ্ছে যেন সেই আলো থেকে। জাহাজের দুপাশে যেমন সারি সারি পোর্টহোল থাকে, সেইরকম সারবন্দি ফুটো রয়েছে প্রত্যেকের দুপাশে। এলসটিডের প্রখর আলোকবৃত্ত এসে পড়তেই যেন নিবে গিয়েছিল তাদের আলোকপ্রভা।

দেখতে তাদের অদ্ভুত মাছের মতো। বিরাট মাথা। প্রকাণ্ড চোখ। কিলবিলে দেহ আর লেজ। চোখ ফেরানো রয়েছে এসটিডের দিকেই। যেন তাকেই অনুসরণ করছে। আলো দেখে আকৃষ্ট হয়েছে নিশ্চয়।

অচিরেই এই ধরনের আরও সামুদ্রিক প্রাণী ভিড় করে এল চারদিক থেকে। গোলক তখনও নামছে নিচের দিকে। ঘোলাটে হয়ে উঠছে জলের রং। আলোকরশ্মির মধ্যে চিকমিক করছে খুদে খুদে কণা–সূর্যরশ্মির মধ্যে ধূলিকণার মতো। সিসের ওজন কাদা ঘুলিয়ে দিয়েছে নিশ্চয়।

সিসের ওজন আস্তে আস্তে গোলক টেনে নামিয়েছিল কাদার ওপর। চারপাশে ঘন সাদা কুয়াশা। কয়েক গজের বেশি এগচ্ছে না বিদ্যুৎ বাতির আলো। বেশ কয়েক মিনিট পর থিতিয়ে গিয়েছিল ঘুলিয়ে-যাওয়া তলানি। বিদ্যুৎ বাতির আর দূরের স্বচ্ছ প্রভাময় মাছের ঝাঁকের আলোয় দেখা গিয়েছিল ধূসর-সাদাটে তলানির ওপর দুলে দুলে সরে যাচ্ছে ঘন কালো সীমাহীন জলরাশি। মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে সামুদ্রিক লিলি ফুলের জটলা। ক্ষুধিত শুড় নাড়ছে শূন্যে।

দূরে দেখা যাচ্ছে দানবিক স্পঞ্জের জটলা। অর্ধস্বচ্ছ বহিঃরেখাই কেবল চোখে পড়ছে। মেঝেময় ছড়িয়ে গাঢ় বেগুনি আর কালো রঙের গুচ্ছ গুচ্ছ চকচকে চ্যাটালো বিস্তর বস্তু। নিশ্চয় কাঁটাওয়ালা সামুদ্রিক প্রাণী। এ ছাড়াও দেখা যাচ্ছে ছোট ছোট বিশালচক্ষু অথবা চক্ষুহীন অদ্ভুত আকারের জিনিস। কাউকে দেখতে কেঠোপোকার মতো, কাউকে গলদাচিংড়ির মতো। আলোকরশ্মির সামনে দিয়ে চলেছে মন্থরগতিতে–অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে অন্ধকারে–পেছনে রেখে যাচ্ছে ফুটকি ফুটকি রেখা।

আচমকা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়েছিল খুদে মাছের ঝাঁক–গোলকের দিকে ধেয়ে এসেছিল হরবোলা পাখির ঝাঁকের মতো। প্রভাময় তুষারের মতো উড়ে গিয়েছিল গোলকের ওপর দিয়ে। পলাতকদের পেছনে দেখা গিয়েছিল আরও বড় প্রাণী। সংখ্যায় অনেক। আসছে গোলকের দিকেই।

প্রথমে দেখা গিয়েছিল অস্পষ্ট দেহরেখা। চলমান আকৃতি। ঠিক যেন মানুষের মূর্তি। তারপরেই আলোকরশ্মির আওতায় এসে গিয়েছিল চলমান বিস্ময়রা। হতভম্ব হয়ে চোখ বুজে ফেলেছিল এলসটিড। পরক্ষণেই চোখ খুলে চেয়েছিল ফ্যালফ্যাল করে। মেরুদণ্ডী প্রাণী নিঃসন্দেহে। অতিশয় বিদঘুটে। গাঢ় বেগুনি রঙের মাথার সঙ্গে বহুরূপী গিরগিটির মাথার কোথায় যেন একটা সাদৃশ্য আছে। কিন্তু অত উঁচু কপাল আর বিরাট করোটি আজ পর্যন্ত কোনও সরীসৃপের ক্ষেত্রে দেখা যায়নি। মুখের খাড়াই দিকটার সঙ্গে অস্বাভাবিক মিল রয়েছে মানুষের মুখের।

বহুরূপী গিরগিটির চোখের মতোই দুটো বিরাট চোখ ঠেলে বেরিয়ে এসেছে কোটর থেকে। রয়েছে ডাঁটির ডগায়। মুখবিবর সরীসৃপ-মুখবিবরের মতো চওড়া। ছোট্ট

নাসিকাগহ্বরের নিচে আঁশযুক্ত ঠোঁট। কানের জায়গায় দুটো বিরাট কানকো-ঢাকনি। ঢাকনি থেকে বেরিয়ে রয়েছে সরু সরু সুতোর মতো প্রবালময় তন্তু। গাছের মতো কানকো বললেও চলে। খুব বাচ্চা রে মাছ আর হাঙর মাছেদের ক্ষেত্রে দেখা যায়। শুধু মুখখানাই মানুষের মতো বলেই যে এদের মানুষের মতো আকৃতি, তা নয়। এর চাইতেও বড় মিল রয়েছে অন্যান্য প্রত্যঙ্গে। অসাধারণ মিল। অত্যন্ত অসাধারণ। প্রতিটি প্রাণীই দুপেয়ে। খাড়া রয়েছে অবশ্য তিনটে প্রত্যঙ্গের ওপর। একটা লেজ আর দুখানা পায়ের ওপর ঠিক যেন পেটমোটা ব্যাঙের পা। এদের দেহও প্রায় গোলাকার। ব্যাঙের সামনের দুটি প্রত্যঙ্গের মতোই দুখানা প্রত্যঙ্গও রয়েছে সামনে। বিদঘুটে গড়ন। মানুষের অতি বিতিকিচ্ছিরি হাত যেন। দুহাতে ধরে রয়েছে একটা লম্বা হাড়। হাড়ের ডগায় তামার ফলা। গায়ের রং এক-এক জায়গায় এক-একরকম। মাথা, হাত আর পা বেগুনি রঙের। চামড়া আলোকময় ধূসর রঙের। জামাকাপড়ের মতোই ঢিলেভাবে চামড়া ঝুলে রয়েছে সারা গায়ে। প্রখর আলোয় ধাঁধিয়ে যাওয়ায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে গোলকের সামনে।

হঠাৎ জোরালো আলোয় ড্যাবডেবে চোখ বন্ধ করে ফেলেছিল বটে, খুলেছিল পরক্ষণেই। ঘন ঘন চোখের পাতা ফেলে আলো সইয়ে নিয়েছিল এক হাত দিয়ে চোখ আড়াল করে। তারপরেই মুখ হাঁ করে বিকট চিৎকার। নিছক আওয়াজ নয়–চিৎকারই বলা উচিত। যেভাবে কথা উচ্চারণ করা হয় মুখ নেড়ে–ঠিক সেইভাবে। স্টিলের আবরণ ভেদ করে চিৎকার পৌঁছেছিল গদি গোলকের ভেতরে। ফুসফুস ছাড়া চেঁচানি সম্ভব হয় কী করে, এলসটিডের মাথায় তা ঢোকেনি। চেঁচিয়ে উঠেই আলোকরশ্মির দুপাশের অন্ধকারে সরে গিয়েছিল কিম্ভুতকিমাকার মূর্তিবাহিনী। চোখ দিয়ে দেখতে না পেলেও এলসটিডের মনে হয়েছে, নিশার দুঃস্বপ্নরা এগিয়ে আসছে গোলকের দিকেই। আলো নিবিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ

বন্ধ করে দিয়েছিল এসটিড। আলো দেখে যদি ছুটে এসে থাকে, অন্ধকারে সরে পড়বে নিশ্চয়। কিন্তু তা হয়নি, আলো নিবে যেতেই আচমকা নরমমতো ধাক্কা লেগেছিল গোলকে। দুলে উঠেছিল গোলক।

আবার শোনা গিয়েছিল বিষম চিৎকার। প্রতিধ্বনি ভেসে এসেছিল যেন অনেক দূর থেকে। প্রতিধ্বনি না বলে তাকে প্রত্যুত্তরই বলা যায়–অন্তত এসটিডের মনে হয়েছিল। তা-ই। আবার থপথপ করে ধাক্কা পড়েছিল গোলকে। দুলে উঠে গোলক, ঘষটে গিয়েছিল তলায় তার জড়ানো কাটিমের ওপর দিয়ে। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে চোখ পাকিয়ে এসটিড চেয়ে ছিল চিরন্তন রাত্রির দিকে। ধু ধু বিস্তৃত অন্ধকারের মধ্যে বহু দূরে দেখেছিল খুব আবছা কয়েকটা দ্যুতিময় অর্ধনর আকৃতি। দ্রুতচরণে আসছে তার দিকেই।

বাইরের জোরালো আলো জ্বালানোর জন্যে তাড়াতাড়ি যেতে গিয়ে এসটিড হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল ভেতরকার লণ্ঠনের সুইচের ওপর। আছড়ে পড়েছিল গদি-মোড়া মেঝের ওপর। দুলে উঠেছিল গোলক। জ্বলে উঠেছিল আলো। কানে ভেসে এসেছিল বিস্ময়ধ্বনি। অপার্থিব সেই চিৎকার। যেন অবাক হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়েই দেখেছিল, নিচের জানলায় চেপে বসেছে দুজোড়া ডাঁটি-চোখ। ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রয়েছে তার দিকে।

পরক্ষণেই বহু হাতের ঠেলাঠেলি শুরু হয়ে গিয়েছিল গোলকের ওপর। প্রচণ্ড ধাক্কায় সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেও পারেনি এলসটিড। ভয়ে প্রাণ উড়ে গিয়েছিল দমদম আওয়াজ শুনে। যেন হাতুড়ির ঘা পড়ছে বাইরের ঘড়ি-যন্ত্রের ওপর!

সর্বনাশ! ঘড়ি-যন্ত্র বিগড়ালে সলিলসমাধি যে অনিবার্য! আচম্বিতে ভীষণভাবে দুলে উঠেছিল গোলক। পা যেন চেপে বসেছিল মেঝেতে। তাড়াতাড়ি ভেতরের লণ্ঠন নিবিয়ে দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছিল বাইরের জোরালো আলো। সমুদ্রতল খাঁ খাঁ করছে। অজানা প্রাণীরা উধাও হয়েছে। দুটো মাছ পরস্পরকে ধাওয়া করতে করতে তলিয়ে গেল জানলার তলায়।

গভীর সমুদ্রের বিচিত্র বাসিন্দারা কি তাহলে দড়ি ছিঁড়ে দিয়েছে? গোলক তাই সবেগে ভেসে উঠছে? মুক্তি তাহলে আর বেশি দূরে নেই।

বাড়ছে... ওপরদিকে ধেয়ে যাওয়ার গতিবেগ বেড়েই চলেছে। আচমকা ঝাঁকুনি খেয়ে দাঁড়িয়ে গেল গোলক। এসটিড ছিটকে গিয়ে ছাদের গদিতে মাথা ঠুকে ঠিকরে পড়ল মেঝেতে। আধ মিনিটের মতো চিন্তা করার ক্ষমতা ছিল না। শুধু বিস্ময়বোধ। অপরিমেয়।

তারপরেই আস্তে আস্তে ঘুরপাক খেতে শুরু করেছিল গোলক। সেই সঙ্গে অল্প অল্প ঝাঁকুনি। মনে হয়েছিল যেন জলের মধ্যে দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ইস্পাত বর্তুলকে। হামাগুড়ি দিয়ে জানলার দিকে গিয়েছিল এলসটিড। নিজের দেহের ওজন চাপিয়ে বর্তুলকে কাত করিয়ে নিয়েছিল সেইদিকে, যাতে জানলা দিয়ে দেখা যায় তলার দৃশ্য। কিন্তু নিঃসীম অন্ধকারে প্রখর আলোর ফিকে হয়ে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়েনি। আলো নিবিয়ে দিলে নিশ্চয় অন্ধকারে চোখ সয়ে যাবে–এই ভরসায় আলো নিবিয়ে দিয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকার পর অর্ধস্বচ্ছ হয়ে এসেছিল মখমল কোমল তমিস্রা। গোধূলি-আলোকের মতো ক্ষীণ আভা দেখা গিয়েছিল বহু দূরে। সেই সঙ্গে চলমান

আকৃতি। একাধিক। দড়ি কেটে দিয়ে নিশ্চয় বিদঘুটে প্রাণীরা গোলক টেনেহিঁচড়ে নিয়ে চলেছে সাগরের তলা দিয়ে।

তারপরেই জলতল-প্রান্তরের ওপর দিয়ে বহু দূরে আবছামতো চোখে পড়েছিল ক্ষীণ প্রভাময় প্রশস্ত দিগন্ত। খুদে জানলা দিয়ে ডাইনে-বাঁয়ে চোখ চালিয়েও সুদীর্ঘ সেই দিগন্তের শেষ দেখতে পায়নি এসটিড। গোলক টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এইদিকেই। খোলা মাঠের ওপর দিয়ে শহরের দিকে বেলুন টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে যেন। এগচ্ছে কিন্তু অত্যন্ত ধীরগতিতে। একটু একটু করে স্পষ্ট হয়ে উঠছে ম্যাড়মেড়ে আলোকপ্রভা। কাছাকাছি জড়ো হয়ে, জমাট বেঁধে, যেন নির্দিষ্ট আকার নিচ্ছে।

পাঁচটা নাগাদ গোলক এসে পৌঁছেছিল আলোকময় সেই অঞ্চলে। দূর থেকে মনে হয়েছিল যেন বিস্তর পথঘাট বাড়ি ঘিঞ্জি অবস্থায় দেখা যাচ্ছে প্রকাণ্ড ছাদহীন একটা মঠের চারদিকে। মঠের মতোই মনে হয়েছিল এলসটিডের। উদ্ভট মঠ। ছাদ নেই। ভেঙে ধসে পড়েছে। পুরো দৃশ্যটা বিরাট মানচিত্রের মতো এলিয়ে রয়েছে পায়ের তলায়। বাড়িগুলো শুধু দেওয়াল দিয়ে ঘেরা, ছাদের বালাই নেই। পরে দেখেছিল, ভেতরে প্রভাময় হাড়ের স্তূপ। দূর থেকে মনে হয়েছিল যেন ডুবো জ্যোৎস্না দিয়ে নির্মিত প্রতিটি বাড়ি।

ঘিঞ্জি অঞ্চলের ভেতরে গুহার মতো সুড়ঙ্গ থেকে দুলছে সামুদ্রিক উদ্ভিদের শুড়। দীর্ঘ, হিলহিলে, স্ফটিকসদৃশ স্পঞ্জ ঠেলে উঠেছে চকচকে খুদে মিনারের মতো। গোটা শহর জুড়ে ছড়িয়ে-থাকা চাপা আভায় চিকমিক করছে মিহি লিলি ফুলের স্তবক। খোলা প্রাঙ্গণে

সঞ্চরমাণ যেন বিপুল জনতা। বহু ফ্যাদম নিচে থাকায় আলাদা করে কাউকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না।

আস্তে আস্তে গোলককে টেনে নামিয়েছিল অদ্ভুত প্রাণীরা। স্পষ্টতর হয়ে উঠেছল খুঁটিনাটি দৃশ্য। একটু একটু করে ভয় জাঁকিয়ে বসেছিল শিরায়-উপশিরায়। মেঘের মতো বাড়িগুলো যেন গোলাকার বস্তুর মতো পুঁতির লাইন দিয়ে চিহ্নিত করা রয়েছে। বেশ কিছু খোলা জায়গায় জাহাজের মতো বিস্তর আকৃতি জড়ো করা রয়েছে।

ধীরগতিতে টেনে নামানো হচ্ছিল গোলককে। নিচের আকৃতিগুলো আরও স্পষ্ট, আরও পরিষ্কার, আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। গোলক নামানো হচ্ছিল শহরের কেন্দ্রে একটা পেল্লায় ইমারতের দিকে। দড়ি ধরে টানছে অসংখ্য প্রাণী–স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে তাদের। একটা জাহাজের কিনারায় ভিড় করে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে গোলক দেখাচ্ছে অগণিত প্রাণী। তারপরেই বিশাল ইমারতের দেওয়াল আস্তে আস্তে উঠে এল চারপাশে-শহর আর দেখা গেল না।

এলসটিড খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছিল দেওয়ালের চেহারা। ডোবা কাঠ, দোমড়ানো তারের দড়ি, লোহার কড়িবরগা, তামার পাত, মানুষের হাড় আর করোটি। আঁকাবাঁকা লাইনে পড়ে রয়েছে করোটি। করোটির বৃত্ত। অত্যাশ্চর্যভাবে বাঁকা করোটির রেখা। অক্ষিকোটরে ঢুকছে আর বেরচ্ছে অগণিত ছোট ছোট রুপোলি মাছ।

আচম্বিতে কানের পরদায় আছড়ে পড়েছিল চাপা গলার চিৎকার। শিঙা বাজানোর মতো প্রচণ্ড আওয়াজ। ফ্যান্টাস্টিক বন্দনাসংগীতে যেন মুখরিত হয়েছিল পুরো অঞ্চল। গোলক তখনও নামছে আস্তে আস্তে। ছুঁচোলো জানলার পাশ দিরে যেতে যেতে এসটিড

দেখেছিল, দাঁড়িয়ে আছে কাতারে কাতারে কিম্ভুতকিমাকার ভৌতিক প্রাণী। নির্নিমেষে ডাঁটি-চোখ মেলে চেয়ে আছে তার দিকে। অবশেষে স্থির হয়েছিল গোলক–অবতীর্ণ হয়েছিল ঠিক মাঝখানে একটা বেদির ওপরে।

নিতল বাসিন্দাদের আবার স্পষ্টভাবে দেখতে পেয়েছিল এলসটিড। অবাক হয়েছিল সাষ্টাঙ্গে সবাই শুয়ে আছে দেখে। দুপায়ে দাঁড়িয়ে আছে কেবল একজনই। গায়ে যেন আঁশ দিয়ে তৈরি শক্ত পোশাক। মাথায় আলোকময় মুকুট। সরীসৃপসদৃশ মুখ খুলছে আর বন্ধ করছে। পূজারি যেন স্তোত্রপাঠ করে যাচ্ছে–শুনে শুনে বলে যাচ্ছে উপাসনারত ভক্তের দল। চাপা গুমগুম ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠেছে ইমারতের ভেতরে বিরাট জায়গা। অদ্ভুত একটা বাসনা মাথায় এসেছিল এলসটিডের। নিজেকে দেখানোর বাসনা। জ্বালিয়ে দিয়েছিল গোলকের ভেতরকার ছোট্ট লণ্ঠন। সঙ্গে সঙ্গে যদিও অন্ধকারে ঢেকে গিয়েছিল বিদঘুটে জীবগুলো। আচমকা ওকে দেখতে পেয়ে প্রবল নির্ঘোষ জেগে ছিল চারদিকে। ভক্তি গদগদ মন্ত্রোচ্চারণ আর নয়–উল্লাসধ্বনি। অন্ধকারে শুধু চেঁচানি শুনে ক্ষান্ত থাকতে পারেনি এলসটিড। ছোট লণ্ঠন নিবিয়ে দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছিল বাইরের জোরালো আলো। নিজে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল বিহ্বল ভক্তদের দৃষ্টি থেকে–কিন্তু দেখা গিয়েছিল, হাঁটু গেড়ে বসে আবার সমস্বরে স্তোত্রপাঠ শুরু করেছে আজব প্রাণীরা। বিরাম নেই, ছেদ নেই। একটানা তিন ঘণ্টা চলেছিল গোলক-পূজা।

আশ্চর্য শহর আর শহরবাসীদের বর্ণনায় খুঁত রাখেনি এলসটিড। চিররাত্রি বিরাজমান। সেই দেশে। সূর্য বা চাঁদ কখনও দেখেনি। দেখেনি তারার মালা। দেখেনি সবুজ পাদপ অথবা বাতাসে শ্বাস-প্রশ্বাসে অভ্যস্ত সজীব জীব। আগুন কী জিনিস, তারা জানে না।

সামুদ্রিক জীব আর উদ্ভিদের ফসফরাস-দ্যুতি ছাড়া অন্য কোনও আলোর সঙ্গে কখনও পরিচয় ঘটেনি।

উদ্ভট গল্প সন্দেহ নেই। কিন্তু অ্যাডামস আর জেনকিন্সের মতো বিজ্ঞানীরা মনে করেন এমন ব্যাপার সম্ভব হলেও হতে পারে। উদ্ভট বলব বরং তাঁদের এই বিশ্বাসকে। তাঁদের মুখেই শুনেছি, নিউ রেড স্যান্ডস্টোন মহাযুগের মহান থেরিওমোরফাঁদের বংশধররা আমাদের মতোই টিকে আছে নিতল সমুদ্রে। জলের মধ্যে শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়া এমন কিছু অসম্ভব ব্যাপার নয়। ধীশক্তি থাকাটাও উদ্ভট মোটেই নয়। মেরুদণ্ডী শুনেও চমকে ওঠার কোনও কারণ নেই। অতি স্বল্প তাপমাত্রায় নিশ্চয় মানিয়ে নিয়েছে নিজেদের। প্রচণ্ড চাপে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। সজীব অথবা নিষ্প্রাণ ভারী বস্তুগুলো ভেসে উঠতে পারে না বলেই তলিয়ে রয়েছে সাগরের গভীরে।

সাগরতলের এই বিচিত্র বাসিন্দাদের মধ্যে আমরা খসে-পড়া উল্কার মতোই মৃত প্রাণী বা বস্তু ছাড়া কিছুই নই। দুর্ঘটনা আর বিপর্যয়ের পর তলিয়ে যায় আমাদের মৃতদেহ অথবা ডোবা জাহাজ। জলময় আকাশের রহস্যময় অন্ধকার ভেদ করে অবতীর্ণ হয় তাদের লোকালয়ে। তাই আমরা অদ্ভুত তাদের কাছেও। নিথর তমিস্রাময় রাতের মধ্যে দিয়ে খসে পড়ে আমাদের যন্ত্রপাতি ধাতু, জাহাজ-বৃষ্টির মতো। ঘাড়ের ওপরেও নিশ্চয় পড়ে থেঁতলে যায়। মাথার ওপরকার মহাশক্তির কাণ্ডকারখানা বলে মেনে নেয়। মাঝে মাঝে এমন জিনিস খসে পড়ে, যা নিতান্তই দুষ্প্রাপ্য অথবা একেবারেই নিষ্প্রয়োজন। কিম্ভুত আকৃতি দেখে তাজ্জব হয়ে যায়। বর্বর অসভ্যদের দেশে আচমকা মহাশূন্য থেকে চকচকে গোলকের মধ্যে আলোকপ্রদীপ্ত প্রাণীর আবির্ভাব ঘটলে যেমন চাঞ্চল্য এবং ভয়মিশ্রিত উপাসনা দেখা যায়, এদের ক্ষেত্রেও নিশ্চয় তা-ই হয়েছে।

এত ব্যাপার একবারে বলেনি এলসটিড। বলতে পারেনি। বারো ঘণ্টার বিচিত্র অভিজ্ঞতা ছাড়া-ছাড়াভাবে শুনিয়েছিল গানবোটের বিভিন্ন অফিসারকে। খুব ইচ্ছে ছিল, নিজেই লিখবে পুরো কাহিনি। কিন্তু লেখা আর হয়ে ওঠেনি। তাই উদ্যোগী হতে হয়েছে। আমাদেরকেই। কম্যান্ডার সিমন্স, ওয়েব্রিজ, স্টিভেন্স, লিন্ডলে এবং অন্যান্য অনেকের মুখ থেকে টুকরো টুকরো কাহিনি শুনে নিয়ে সাজিয়ে দিলাম পরপর।

টুকরো টুকরো বর্ণনার মধ্যে দিয়েই কিন্তু গা-ছমছমে দৃশ্যটা যেন ভেসে ওঠে চোখের সামনে। বিরাট ভৌতিক ইমারত, হেঁট মাথায় স্তোত্রপাঠে তন্ময় আজব প্রাণী, বহুরূপী গিরগিটির মতো গাঢ় রঙের মাথা, ক্ষীণ প্রভাময় বসন, ফের আলো জ্বালিয়ে দিয়ে এলসটিডের বৃথাই বোঝানোর চেষ্টা যে, গোলকে বাঁধা দড়িটা এবার কেটে দেওয়া হোক। মিনিটের পর মিনিট কেটেছে অসহ্য উৎকণ্ঠায়। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ভয়ে প্রাণ উড়ে গেছে এলসটিডের, অক্সিজেন ফুরাতে আর মোটে চার ঘণ্টা বাকি। কিন্তু বিরতি নেই ভজনায়। এসটিডের কাছে তা মৃত্যু-সংগীতই মনে হয়েছে।

কী করে যে শেষকালে মুক্তি পেয়েছিল এলসটিড, তা নিজেই বোঝেনি। গোলকের তলায় ঝোলা দড়িটা বেদির কিনারায় ঘষটে কেটে যেতে পারে। আচমকা ভয়ানকভাবে ঘুরপাক খেয়ে বর্তুল সাঁ সাঁ করে ধেয়ে গিয়েছিল ওপরদিকে। বায়ুশূন্য আধারের মধ্যে সুরক্ষিত অবস্থায় ইথিরীয় প্রাণীর ছিটকে যাওয়ার মতো–ভূপৃষ্ঠের ঘন বায়ুমণ্ডল থেকে স্বদেশের ইথিরীয় পরিমণ্ডলে ফিরে যাওয়া যেন। বাতাসের স্তর ভেদ করে তীব্রবেগে হাইড্রোজেনের বুদবুদ যেভাবে ছিটকে যায়, গোলকের সেই ধরনের চকিত ঊর্ধ্বগতি দেখে নিশ্চয় থ হয়ে গিয়েছিল নিতল বাসিন্দারা।

সিসের ওজন নিয়ে যে গতিতে গোলক তলিয়েছিল, ভেসে উঠল তার চেয়ে অনেক বেশি গতিবেগে। ফলে, গরম হয়ে গিয়েছিল সাংঘাতিকভাবে। জানলা দুটো ওপরদিকে করে ছিটকে যাওয়ায় এলসটিড দেখেছিল, ফেনার মতো বুদবুদের প্রপাত আছড়ে পড়ছে কাচের ওপর। প্রতিমুহূর্তে মনে হয়েছে, এই বুঝি কাচ খুলে ঢুকে এল ভেতরে, তারপরেই আচমকা যেন একটা চাকা বনবন করে ঘুরপাক দিয়ে উঠেছিল মাথার মধ্যে, গদি-মোড়া কামরা চরকিপাক দিয়েছিল চারপাশে। জ্ঞান হারিয়েছিল এলসটিড। এরপরেই মনে পড়ে, শুয়ে আছে কেবিনে, কানে ভেসে এসেছে ডাক্তারের গলা।

এলসটিড নিজেই লিখবে বলেছিল অত্যদ্ভুত এই উপাখ্যান যন্ত্রপাতি মেরামত করে নেওয়ার পর।

কিন্তু ১৮৯৬ সালের দোসরা ফেব্রুয়ারি আবার গোলক নিয়ে সমুদ্রতলে পাড়ি জমায় এসটিড, আর ফেরেনি। তেরো দিন অপেক্ষা করার পর গানবোট রিওতে ফিরে এসে তারবার্তা পাঠায় বন্ধুবান্ধবদের।

আপাতত এর বেশি আর কিছু জানা যায়নি। গভীর সমুদ্রের তলদেশে এমন একটা শহরের অস্তিত্ব কেউ কোনওদিন কল্পনাও করতে পারেনি। সুতরাং আশ্চর্য এই কাহিনি ছড়িয়ে পড়ার পর নিশ্চয় অন্য কেউ গোলক নিয়ে যাবে শহর দেখতে, এই আশা নিয়েই শেষ করা যাক নিতল নগরীর কাহিনি।